শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণম্

অজয়কুমার ভট্টাচার্য

পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই বঙ্গভূমির আকাশ ধূসর। লক্ষ্মণসেনের পতন ঘটেছে কয়েক শতাব্দী আগেই, কিন্তু সমাজজীবনে সেনবংশের শেষদিক থেকে যে-অবক্ষয় শুরু হয়েছিল তা ক্রমবর্ধমান। বৌদ্ধ পালবংশের উদার সমাজব্যবস্থা, সেন-রাজত্বকালে তাঁদের গৃহীত দৃঢ় ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুশাসনে অস্তমিত। বৃহত্তর জনসমাজ, বিশেষত কৃষককুল অবজ্ঞাত ও অবহেলিত, যদিও সমাজ মূলত কৃষিভিত্তিক। উচ্চবর্ণের সেবাই তাদের ধর্ম। ব্রাহ্মণেরা স্মৃতি, ন্যায়, জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা ও তর্কযুদ্ধে অপর পণ্ডিতদের হারিয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ব্যস্ত। নাম, যশ, অর্থ ইত্যাদি অর্জনই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সমগ্র জীবনের এমনকী রাজকার্যেরও নিয়ামক জ্যোতিষ; পুরুষকার অন্তর্হিত। বখতিয়ার খিলজি অশ্বব্যবসায়ী সেজে মাত্র আঠারোজন অশ্বারোহী নিয়ে নবদ্বীপে সেন রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে অধিকার করেছিলেন—এ যে গল্পমাত্র নয় তা ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন। উপেক্ষিত ও পুরুষকারহীন ব্রাত্য জনসমাজ পাঠান আক্রমণ ঠেকানোর চেষ্টাও করেনি, তাই সে-বিজয়ের একশো বছরের মধ্যেই সমগ্র বঙ্গদেশ পাঠান-অধীনে চলে আসে। সামাজিকভাবে নিপীড়িত মানুষ শাসক-আনুকূল্য লাভের আশায় দলে দলে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। ধূসর থেকে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করতে চলা এই বঙ্গের আকাশকে নতুন রঙে রাঙাতে দোলযাত্রার দিন গৌরাঙ্গ অবতারের জন্ম। স্বামী সারদেশানন্দ তাঁর 'শ্রীচৈতন্যদেব' গ্রন্থটিতে মন্তব্য করেছেন, সে-সময়ে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব না ঘটলে বঙ্গদেশে হিন্দু নামধারী আর বিশেষ কেউ বর্তমান থাকত না।

তাই ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে চৈতন্যদেবের আগমন একটি যুগপ্রয়োজন সিদ্ধ করে। গীতার কৃষ্ণপ্রতিশ্রুতি বুদ্ধ, শংকরাচার্য, গৌরাঙ্গ হয়ে অধুনা শ্রীরামকৃষ্ণে নিশ্চিতভাবে সত্য প্রমাণিত। চৈতন্যদেবের আগমনে জনসমাজের জাগরণ, ব্রাত্যজনের সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসা, সমাজে তাদের একটি নিশ্চিত অবস্থান তৈরি হওয়া এবং সর্বোপরি সমাজে এক আধ্যাত্মিক সংহতি সমাজকে অবক্ষয়ের শেষ সীমা থেকে ফিরিয়ে এনেছিল। তিনি সর্বসাধারণকে দিলেন নামকীর্তনের আনন্দ। নিজে তার পুরোধা হয়ে কীর্তনের মাদকতায় সমাজকে ভাসিয়ে দিতেই

সমাজের সুপ্ত অধ্যাত্মবোধ ক্রমে উদ্দীপিত হয়ে উঠল। সে-নামের বন্যায় সর্বপ্রকার উচ্চ-নীচের ভেদ গেল ঘুচে। এই কীর্তনে অদ্বৈত আচার্য আর যবন হরিদাসের আলিঙ্গনে বাধা নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে রচিত গানটি চৈতন্যদেবের সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হয় : ''ভকতকুসুম যত আনিলে আপন সাথ/ নন্দনকাননের সুন্দর পারিজাত/ সে-কুসুমে ভরি সাজি আপনি পূজারি সাজি/ করিলে আপন পূজা ধরি মুখে নিজ নাম।''

সপার্ষদ তাঁর আগমন। কৃষ্ণের অবতাররূপে যাঁর অন্তরে কৃষ্ণ সদা বিরাজমান তিনি রাধাভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণভক্ত সেজে সপার্ষদ দোরে দোরে কৃষ্ণনাম বিলোচ্ছেন। অবতারেরা ভাঙতে আসেন না, তাই শংকরাচার্য-প্রবর্তিত পথে তাঁর দীক্ষা ঈশ্বরপুরীর কাছে, আর সন্ন্যাস কেশব ভারতীর কাছে। দশনামী সম্প্রদায়ের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে চৈতন্যদেব সারাজীবন কঠোর সন্ন্যাসব্রত পালন করে গিয়েছেন, সেইসঙ্গে সবহারানো জনসমাজের প্রতি অসীম করুণায় তাদের সার্বিক উন্নতির জন্য জীবন দান করেছেন। সে-আদর্শকে নামিয়ে এনে আমাদের সুবিধার্থে তাঁকে শিখা-সূত্র-কণ্ঠীধারী সাজানো আমাদের আধ্যাত্মিক দেউলিয়াপনাই প্রকাশ করে। তাঁর রচিত 'শিক্ষাষ্টকম্' তাঁর জীবন ও বাণীর সূত্রাকারে প্রকাশ, আবার আমাদের সাধনপথেরও অমোঘ দিঙ্‌নির্দেশ। সে-বিষয়ে প্রবেশের একটু চেষ্টা আমরা করতে পারি।

যুদ্ধিষ্ঠিরকে বকরূপী ধর্মের প্রশ্নগুলির মধ্যে তিনটি প্রশ্ন এ-প্রসঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। প্রশ্ন ছিল ''কিমাশ্চর্যম্?''—আশ্চর্য কী?—''অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।/ শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্॥'' আমরা নিরন্তর মৃত্যুমিছিলের সামনে দাঁড়িয়ে যেন দ্রষ্টা, যেন এ-পরিণতির থেকে আমরা মুক্ত, এ-ভাবনার চেয়ে আশ্চর্য আর কী হতে পারে! প্রতিপ্রশ্ন হল : ''কা চ বার্তা''—এতে আমরা কী বুঝছি? যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, ''অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে/ সূর্যাগ্নিনা রাত্রিদিনেন্ধনেন/ মাসর্তদর্বিপরিঘট্টনেন/ ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা॥''—এ-জগৎ যেন এক বিশাল কড়াই। তাতে রাত্রি আর দিনরূপ ইন্ধনকে সূর্যরূপ অগ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত করে, মাস ও ঋতুরূপ হাতা দিয়ে সমগ্র ভূতকে কাল পরিপাক করছেন।

অতএব প্রশ্ন : ''কঃ পন্থাঃ?''—উপায় কী? উত্তর হল : ''বেদা বিভিন্না স্মৃতয়ো বিভিন্না/ নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্। ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতো গুহায়াং/ মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ॥''—জ্ঞানের শেষ নেই, পালনীয় আচারবিধিও অনন্ত, ধর্ম যেন অগম্য গুহার মধ্যে লুক্কায়িত, তাই মহাপুরুষ কর্তৃক নির্দিষ্ট পথই অনুসরণীয়।

আধিকারিক পুরুষ এই জগৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন। ধ্যানে ও মননে তার উত্তর খুঁজে পান তাঁরা। যুক্তিগ্রাহ্য ও অনুভবসিদ্ধ হয়ে সেগুলি তত্ত্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ঈশ্বর যেমন অনন্ত তেমনই তাঁর তত্ত্বও অনন্ত; সাধারণ মানুষের পক্ষে তার উপযোগী তত্ত্ব নির্বাচন করা দুরূহ। তাই ঈশ্বর নিজে মানুষ হয়ে আসেন তাদের উপযোগী ধর্মজীবন যাপনের মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছনোর পথ দেখাতে। স্বামীজী বলেছিলেন : এবার মাথার কাজ (নিজেকে দেখিয়ে) এই-ই করে গেল, তোরা কেবল দাগা বুলিয়ে যা। তবু মানুষ যেহেতু যুক্তিবাদী তাই তার মনে প্রশ্ন উঠবেই, তবে সে-প্রশ্নের জবাবও পথেরই দুধারে উৎকীর্ণ থাকে। মহাপ্রভু সাধারণের জন্য দিলেন কৃষ্ণনামসংকীর্তন। কিন্তু সন্দেহ জাগে—যোগ, উপাসনা, উগ্র তপস্যা ছেড়ে শুধু নামে কী হবে? শিক্ষাষ্টকম্-এর প্রথম শ্লোকে মহাপ্রভু সে-সন্দেহ ভঞ্জন করেছেন কৃষ্ণনামমাহাত্ম্য বর্ণনা করে :

''চেতোদর্পণমাজনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণম্
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।

আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্॥"

শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তন আমাদের চিত্তদর্পণকে মার্জিত করে। চিত্ত একটি দর্পণের মতন যাতে ঈশ্বর প্রতিবিম্বিত হন। বাইরে নয়, চিত্তের অন্তঃস্তলে তিনিই আছেন আমাদের মনের মালিন্যে আচ্ছাদিত হয়ে। বস্তুত মনের অস্তিত্ব আমরা অনুভব করি তার বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে দ্রুত গমনাগমন থেকে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি আর শুদ্ধ আত্মা একই বস্তু। মন মালিন্যহীন হয়ে যখন নির্বিষয় হয় তখন তার আলাদা অস্তিত্ব আমাদের অনুভবে থাকে না, তার লয় হয়, আর তখনই ঈশ্বর—যিনি আমাদের স্বরূপ—তিনি প্রতিভাসিত হন। কৃষ্ণনাম বহুজন্ম-আহৃত বিষয়চিন্তাজাত মালিন্যকে আমাদের মন থেকে দূর করে।

'ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণম্'—দাবানল যে কী বিভীষিকা তা প্রত্যক্ষদর্শী মাত্রই জানেন, কারণ তা নিয়ন্ত্রণে আনা দুঃসাধ্য। এই ভবসংসার তার থেকেও অধিকতর—মহাদাবাগ্নিস্বরূপ। কিন্তু এটি আমাদের অনুভবে নেই। মাঝেমধ্যে অনলসদৃশ মনে হলেও তা দাবাগ্নি কখনও মনে হয় না। তাই সে-অনুভবটুকু আমাদের সংসারে বিরাগ ঘটায় না। তাই যদি হয় তাহলে আর তার নির্বাপণ কেমন করে হবে? কথামৃতকার শ্রীমকে শ্রীরামকৃষ্ণ বৈরাগ্য কাকে বলে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উত্তরে তিনি বলেন, বৈরাগ্য শুধু বিষয়ে বিরাগ নয়, ঈশ্বরে অনুরাগ ও বিষয়ে বিরাগ। কৃষ্ণনাম কৃষ্ণে অনুরাগ উৎপন্ন করে আর তার ফলে সেই বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় যাতে এই ভবসংসার মহাদাবানলসদৃশ বোধ হয়। তখন আবার এই কৃষ্ণনামই ভক্তকে সে-দাবানল থেকে মুক্ত করে।

কৃষ্ণনাম 'শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণম্'—শ্রেয়োরূপ শ্বেতপদ্মের ওপর চন্দ্রালোক বিতরণ করে। আমাদের জীবনে শ্রেয় ও প্রেয় দুটি দিক। গীতায় বলা হয়েছে, 'অগ্রে বিষমিব পরিণামে অমৃতোপমম্' হচ্ছে শ্রেয়, আর 'অগ্রে অমৃতোপমম্ পরিণামে বিষমিব' হল প্রেয়—যার সেবায় আমরা আমাদের জীবনকে উৎসর্গ করি। পূর্ণিমার রাতে প্রস্ফুটিত কুমুদের ওপর জ্যোৎস্নার বিকিরণ যেমন এক মায়াময় আকর্ষণের সৃষ্টি করে, সেরকম কৃষ্ণনাম শুধু শ্রেয়োরূপ অধ্যাত্মপথকে আমাদের সামনে তুলে ধরে না, সাধনপথের 'অগ্রে বিষমিব'-এর বিষটুকু তুলে নিয়ে সে-পথকে শ্বেতকুমুদের ওপর কৌমুদী বিকিরণের মতো আকর্ষণীয় ও আদরণীয় করে তোলে। এই তুলনাটি অবতারের সম্পর্কেও বলা চলে। তাঁর সামনে উপস্থিত ব্যক্তির মনে হয় যে ঈশ্বরলাভ উদ্দেশ্য তো বটেই, তা লাভও যেন দুরূহ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে এক পণ্ডিত বলেছেন, ''আপনার এখানে যতক্ষণ ততক্ষণ পূর্ণবৈরাগ্য।'' স্বামীজী সম্বন্ধে নিবেদিতা লিখেছেন : ''স্বামীজীর এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার নিকট যাঁহারা অবস্থান করিতেন, তাঁহাদের সকলকে তিনি বড় করিয়া তুলিতেন। তাঁহার সান্নিধ্যে মানুষ তাহার জীবনের অনভিব্যক্ত মহৎ উদ্দেশ্য যেন স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইত, এবং দেখিয়া উহাকে ভালবাসিতে শিখিত।'' চৈতন্যদেবের কৃষ্ণনামে তন্ময়তা উপস্থিত ব্যক্তিদের মনকে নির্বিষয় করে দিত।

'বিদ্যাবধূজীবনম্'—বিদ্যা অর্থাৎ পরাবিদ্যা—'যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে'—যার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হই। এটিকে বধূর সঙ্গে তুলনা করলেন শ্রীচৈতন্য। সাধ্বী স্ত্রী যেমন পতির অনুগামী ও সর্বপ্রকারে স্বামীর ধর্মপথের সহায়িকা, সেইরকম কৃষ্ণনাম জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থেকে তাকে পরাবিদ্যা দান করে।

কৃষ্ণনাম 'আনন্দাম্বুধিবর্ধনম্'—নাম করতে করতে মানুষ আনন্দসাগরে ভাসে। শুধু ভাসে না, তার সে-আনন্দ ক্রমবর্ধিত হতে হতে মহাসাগর,

অনন্তসাগরে পরিণত হয়। প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্—কবি বলেছেন ''পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়/ পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়''। আনন্দের সন্ধানে কষ্টের পথ চলা এ নয়, এ-পথের দুধারে আনন্দের পসরা, প্রতিপদক্ষেপে পূর্ণ অমৃতের আস্বাদন করতে করতে পথ চলা।

'সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্' —অবগাহন স্নান আমাদের শান্তি দেয়, শরীরকে শীতল, আর্দ্র করে তোলে; কৃষ্ণনামামৃতে কীর্তনকারী স্নাত হয়, আনন্দরসে রসে থাকে। এগুলিই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনের বৈশিষ্ট্য।

অবতারেরা ভাঙতে আসেন না, সংকীর্ণতার নামগন্ধ তাঁদের থাকে না। তাই কেবল কৃষ্ণনামের কথা বলায় কেউ যদি সংকীর্ণতার গন্ধ পান তাই পরবর্তী শ্লোকে শ্রীচৈতন্য বলেছেন :

''নাম্নামকারী বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্
মমাপি দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনী নানুরাগঃ॥''

—হে ঈশ্বর, তুমি অসংখ্য নাম সৃষ্টি করে তা ধারণ করেছ; শুধু তাই নয় তার প্রতিটিতে তোমার সর্বশক্তি অর্পণ করেছ। সে-নাম নেওয়ার কোনও নির্দিষ্ট আচার ও নিয়ম, এমনকী কোনও নির্দিষ্ট কালও স্থির করে দাওনি, তবু হায়, তোমার নামে আমার অনুরাগ জন্মাল না। ভক্তদের হয়ে তাঁর এই আক্ষেপ আমাদের প্রাণে নামে রুচি আনার প্রার্থনা শেখায়।

নামমাহাত্ম্যের অর্থ এই নয় যে জীবনচর্যার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। উপায় কী—এই প্রশ্নের উত্তরে এক গোস্বামী শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেন যে কলিতে নামেই হবে, কলিতে নামমাহাত্ম্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ''শুধু নাম করে যাচ্ছি কিন্তু কামিনী-কাঞ্চনে মন রয়েছে, তাতে কি হয়?'' গোস্বামী বললেন, ''তাহলে অজামিল?'' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ''হয়তো অজামিলের পূর্বজন্মে অনেক কর্ম করা ছিল।'' আসলে এই গল্পটি বলে আমরা নিজেদের সুপ্ত বাসনাভোগের ছাড়পত্র দিই যা নিজেকে প্রতারণা ভিন্ন আর কিছু নয়। পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ বলতেন, শেষ সময়ে অজামিল ছেলেকে ডাকলেন নারায়ণ বলে—ছেলে বুঝতে পারল তাকে ডাকা হচ্ছে আর ভগবান এতই বোকা যে তিনি বুঝলেন না তাঁকে ডাকা হচ্ছে না! ভাবগ্রাহী জনার্দন, তিনি ভাবের দাস, শব্দের নন। অনেকসময় এও বলা হয় যে কে কোথায় আছি বা কী করছি সেটা বড় কথা নয়, আন্তরিক তাঁকে ডাকলেই হল। ঠিক কথা। কিন্তু ওই আন্তরিকতাটুকু আনতেই জীবনে, আচরণে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। চৈতন্যদেবের পরবর্তী শিক্ষা তাই জীবনচর্যার।

''তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥''

—সর্বদা হরিকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের সান্নিধ্যবোধহীন নিজেকে তৃণ অপেক্ষাও হীন মনে করা। এ-হীনতা নিজের ঈশ্বরভাবনার দৈন্য উপলব্ধি করায়। এর একটি ইতিবাচক দিকও আছে। তৃণ পদপিষ্ট হতে হতে পথচারীর পথ তৈরি করে দেয়, শুধু তাই নয় পদচারীর চরণে সুখস্পর্শ প্রদান করে।

'তরোরপি সহিষ্ণুনা'—বৃক্ষ তিতিক্ষার মূর্ত প্রতীক। সে তার জীবন দিয়ে তার অঙ্গচ্ছেদকারীর উপকার করে। হাতজোড় করে নিজেকে অধম ঘোষণা নয়, কারণ তাতে নিজের প্রচ্ছন্ন অহংকারই প্রকাশ পায়। ঈশ্বরে অনুরাগহীনতার দৈন্যে নিজের ক্ষুদ্রতার উপলব্ধি ও তিতিক্ষা অবলম্বন করে অপরের মঙ্গলের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা।

'অমানিনা মানদেন'—মানহীন ব্যক্তিকে মান দান। বস্তুত আমরা কাউকেই মান দিই না নিজের ক্ষুদ্র অহংকে ছাড়া। শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের সংজ্ঞা দিয়েছেন 'মানহুঁশ'। আমাদের মান বা মূল্য হল

অন্তরে তাঁর উপস্থিতি, যাঁর সম্বন্ধে আমাদের হুঁশ নেই। অপরের মনুষ্যত্বের মান দিলে তবেই নিজের মনুষ্যত্বের হুঁশ থাকে। এ-বিষয়ে একটি অভিজ্ঞতার ভাগ দিতে ইচ্ছে করছে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগের কথা। বাঁকুড়া মঠের আশেপাশে তখন চরম দারিদ্র্যে ঘেরা মানুষজনের বাস। বসন্তের এক পড়ন্ত বেলায় স্বামী বিশ্ববেদানন্দজী রাস্তায় বেরিয়েছেন। রাস্তার পাশে পোড়ো জমিতে এক বৃদ্ধা অতি ছিন্নবস্ত্রে, সর্বাঙ্গে বহুকালের দৈন্যের ছাপ নিয়ে শুকনো ডালপালা কুড়োচ্ছে। তার নিজের রাঁধবার কোনও উপকরণ আছে বলে মনে হয় না, হয়তো এগুলি কাউকে জুগিয়ে নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা। মহারাজ তার দিকে এগিয়ে গিয়ে অতি স্নেহমাখা কণ্ঠে বললেন, ''মাগো, দেখো ওইটি আমার ঘর, তোমার ছেলে গরিব, সবাইকে দেবার ক্ষমতা তো নেই, তাই মা চুপি চুপি একবার আমার ঘরে এসো, একটা কাপড় আছে তোমায় দেব।'' বৃদ্ধা হয়তো রুক্ষ গলায় 'এই বুড়ি' ডাকে অভ্যস্ত, তাই একটু অবাক এই আন্তরিক ডাকে। সে ঘরে এলে মহারাজ তাকে একটি কাপড়, দুটি টাকা ও প্রসাদি নাড়ু দিলেন। বৃদ্ধার সে-উজ্জ্বল মুখ আজও মনে পড়ে—যা শুধুমাত্র টাকা ও কাপড়ের জন্য নয় নিশ্চিত, বরং মহারাজের কাছে তার বহুকাল খুইয়ে বসা মাতৃত্ব ও মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি পেয়ে।

জীবনচর্যা পরিবর্তনের অন্যতম উপকরণ প্রার্থনা। সে-প্রার্থনা বিষয়বাসনা পূরণের জন্য নয়, যা শ্রীরামকৃষ্ণের মতে ঈশ্বরের কাছে লাউ-কুমড়ো চাওয়ার মতো হীনবুদ্ধির কাজ। মহাপ্রভু আমাদের শেখাচ্ছেন :

''ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা
জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তি-
রহৈতুকী ত্বয়ি॥''

—হে ঈশ্বর, বিষয়ভোগের জন্য আমি ধন চাই না, কর্তৃত্ব করতে লোকজন চাই না, ভোগের অন্যতম উপকরণ সুন্দরী রমণী চাই না, এমনকী কাব্যচর্চার সূক্ষ্ম আনন্দভোগও চাই না, কেবল তোমার পাদপদ্মে যেন জন্মে জন্মে আমার অহেতুকী ভক্তি থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমাচরণকে বলেছিলেন, ''অহেতুকী ভক্তি,—তুমি এইটি যদি সাধতে পার, তাহলে বেশ হয়। মুক্তি, মান, টাকা, রোগ ভাল হওয়া, কিছুই চাই না;—কেবল তোমায় চাই। এর নাম অহেতুকী ভক্তি। বাবুর কাছে অনেকেই আসে—নানা কামনা করে; কিন্তু যদি কেউ কিছুই চায় না কেবল ভালবাসে বলে বাবুকে দেখতে আসে, তাহলে বাবুরও ভালবাসা তার উপর হয়।''

আরও প্রার্থনা :

''অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়॥''

—হে নন্দসুত কৃষ্ণ, তোমার দাস এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ভবসাগরে পড়ে আছে, কৃপা করে তাকে তোমার পদসংলগ্ন ধূলিকণা বলে মনে কোরো। ধূলিকণা অতি ক্ষুদ্র কিন্তু চরণে লেগে থাকার ক্ষমতা রাখে, তাই ধূলিকণা হয়ে তাঁর চরণে লগ্ন হওয়ার প্রার্থনা।

প্রথম দিনে কথামৃতকার শ্রীম দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে উপস্থিত ভক্তদের শ্রীরামকৃষ্ণকে বলতে শুনেছিলেন : ''যখন একবার হরি বা একবার রামনাম করলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয়ই জেনো যে সন্ধ্যাদি কর্ম—আর করতে হবে না।'' নামসংকীর্তনের অন্যতম ফল এই নাম ও নামীর অভেদ বোধ।

নামকীর্তনে আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির স্তরগুলি এক-এক করে পেরোলে কী অবস্থা হয় মহাপ্রভু সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন :

''নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদ্‌রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব
নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥''

—হে প্রভু, কবে তোমার নামকীর্তনে আমার চোখ অশ্রুধারায় প্লাবিত, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে গদগদ বাক্য ও সমগ্র শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে! নীলকণ্ঠের যে-গান শ্রীরামকৃষ্ণকে সমাধিস্থ করত :

''কতদিনে হবে সে-প্রেমসঞ্চার
বলব হরিনাম হয়ে পূর্ণকাম
নয়নে বহিবে প্রেম অশ্রুধার।''

শক্তিসাধক এই প্রেমেরই আকাঙ্ক্ষায় গেয়ে ওঠেন :

''এমন দিন কি হবে মা তারা
যবে তারা তারা বলে দুনয়নে পড়বে ধারা
হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে
মনের আঁধার যাবে টুটে
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে
তারা বলে হব সারা।''

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, এই ব্যাকুলতা হলেই বস্তুলাভ। নারদীয় ভক্তি, যার লক্ষণে নারদ বলেছেন : ''তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্‌বিস্মরণে পরমব্যাকুলতা ইতি''—সমস্ত তাঁকেই সমর্পণ এবং যখন তাঁকে মুহূর্তের বিস্মরণে পরম ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়। এই অবস্থা লাভ হলে ভক্তের কী মনে হয় মহাপ্রভু সেটি বলছেন :

''যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্‌।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥''

—গোবিন্দবিরহে আমার চোখের নিমেষ যেন যুগে পরিণত হয়, অশ্রুপাতের বর্ষাধারা নামে, সমগ্র জগৎ শূন্য বোধ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ''কিন্তু নিষ্ঠাভক্তি একটি আছে। গোপীরা যখন মথুরায় গিয়েছিল তখন পাগড়িবাঁধা কৃষ্ণকে দেখে ঘোমটা দিল আর বললে : 'ইনি আবার কে, আমাদের পীতধড়া মোহনচূড়া পরা কৃষ্ণ কোথায়?' '' শ্রীহনুমানের কথা :

''শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥''

—পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম অভেদ, তথাপি কমললোচন রামই আমার সর্বস্ব।

নামে মত্ত, নামীতে নিমগ্ন একনিষ্ঠ ভক্তের ভাবটি প্রকাশিত শেষ শ্লোকে :

''আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্‌
অদর্শনাৎ মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥''

—লীলাময় আমায় আলিঙ্গনে বা পায়ের তলায় পিষ্ট করুন, অথবা দর্শন না দিয়ে মর্মাহত করুন, কিংবা তাঁর যেমন প্রাণ চায় তেমনই আমাকে ব্যবহার করুন—তবু তিনিই আমার প্রাণনাথ, আর কেউ নন। দক্ষিণারঞ্জন গুহ স্বামীজীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। স্বামীজী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : ''আচ্ছা ধর, আমার কিছু টাকার দরকার, তার জন্য যদি তোকে চা বাগানের কুলি বলে বিক্রি করি তুই রাজি আছিস তো?'' সেই প্রেমপূর্ণ চোখের দিকে তাকিয়ে শিষ্যের হ্যাঁ বলতে দ্বিধা হয়নি। এই নিষ্ঠাভক্তি তাঁকে সর্বজনপূজ্য স্বামী কল্যাণানন্দ করে তুলেছিল।

নামের মহিমা, অধ্যাত্মপথে সাধারণের জন্য নামের অনিবার্যতা প্রচার করে গেছেন চৈতন্যদেব। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ''ভক্তিপথ সহজ পথ'' আর সে-পথের পাথেয় ঈশ্বরের নামগুণগান, সৎসঙ্গ ও মাঝে মাঝে নির্জনবাস। তাঁদের আগমন অধ্যাত্মপথকে সুগম করতে—শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণম্‌। কবির ভাষায় এ-নামমাহাত্ম্য :

''তোমারই নাম বলব নানা ছলে...
বলব বিনা ভাষায় বলব বিনা আশায়
বলব মুখের হাসি দিয়ে, বলব চোখের জলে...
শিশু যেমন মাকে, নামের নেশায় ডাকে
বলতে পারে, এই সুখেতেই
মায়ের নাম সে বলে।''